জীবন

রাজা

অ্যাই ! নাম কিরে তোর ?---
মোটা ফ্রেমের চশমা পরা, ঝাঁটার মত গোঁফওয়ালা, কোলাব্যাঙের মত মোটা, কালো ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন--- কি নাম? অ্যাঁ---? এতক্ষণে বোঝা গেল ছেলেটা কথা বলতে পারে না। কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে অস্ফুট কয়েকটা শব্দ বের হয়।
নি শব্দে, হাত পেতে ঘুরে ঘুরে, সকলের কাছে ভিক্ষা চাইছিল ছেলেটা। কেউ দিল, কেউ দিল না। সবার কাছে চাওয়া শেষ করে, সবাইকে অবাক করে দিয়ে জানালার ধারের একটা সিঙ্গল সীটে বসে পড়ল।
সেই সীটটাতে আগে থেকেই রঙ ওঠা নীল লুঙ্গী আর নতুন গোলাপী শার্ট পরা চিমড়ে চেহারার একজন বসেছিল। তাকে প্রতিবাদ করার কোনও সুযোগ না দিয়ে জানালার ধার ঘেঁষে বসে পড়ল ছেলেটা। বাইরের ছুটন্ত ছবি দেখতে লাগল।
ছোট বলেই হয়ত কিছু বলতে পারল না গোলাপী শার্ট। রিক্ত মুখে, যতটা সম্ভবত সরে বসে জায়গা করে দেয় বোবা ভিখারী বাচচাটাকে।
ঠিক দু-ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট দেরিতে ছুটছে ট্রেনটা। অনীক মনে মনে হিসাব করে নেয় হাতঘড়ি দেখতে দেখতে। বিরক্ত হয়ে কোনও লাভ নেই কারণ তাতে বিরক্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই অসহ্য গরমে তাই,জায়গায় চুপচাপ বসে সিগারেট টানাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে ওর মনে হয়।
রামপুরহাট পর্যন্ত যাবে অনীক। এই গাড়িটাও। বর্ধমানে প্রায় পঞ্চাশ মিনি ট দাঁড়িয়েছিল। কেন? সে জানেনা। তবে এই ফাঁকে ও অবশ্য প্ল্যাটফর্মে নেমে খানিক পায়চারী করে একটানা বসে থাকার জড়তা কাটিয়ে নিয়েছিল।
একটা নামকরা ওষুধের কোম্পানীতে কাজ করে অনীক। এরিয়া সেল্‌স্‌ ম্যানেজার। মাইনেটা বেশ মোটাইপায়। তবে দায়িত্বও অনেক। বাবা-মা-র একমাত্র সন্তান সে। দমদম নাগের বাজারে নিজেদের বাড়ি। বাবা মানিক সেন আয়কর ভবনে বসেন। রিটায়ারমেন্টের এখনও কয়েক বছর দেরি আছে।
অনীক সামনের জুন মাসের এগারো তারিখে আটাশ বছর পূর্ণ করবে। সাড়ে তিন বছর আগে এই ফার্মে ঢুকেছিল সেল্‌স্‌ রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌ হয়ে। নিজের চেষ্টা আর যোগ্যতায় আজ ও উন্নতি করেছে। আরও করবে। অনেক উঁচুতে উঠতে হবে ওকে। ও তাই চায়।
মা আবার এখন থেকেই মেয়ে দেখতে শু করে দিয়েছে। মাকে নিয়ে আর পারা যায় না।
এই ট্রেনটা যে রোজই লেট করে অনীকের জানা ছিল। তবুও এই ট্রেনটাতেই উঠেছিল। আসলে, একটা চাপলে আর গাড়ি বদল করার ঝামেলা থাকে না। সরাসরি দমদম থেকে উঠে রামপুরহাট চলে যাওয়া যায়। বর্ধমান পর্যন্ত সাধারণত ফাঁকাই যায় ট্রেনটা। বেশ হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে বসা যায়। তাছাড়া আজ কোনও তাড়া নেই। রামপুরহাটে একবার পৌঁছে গেলে স্টেশনথেকে সেজো পিসীর বাড়ি মাত্র সাড়ে চার মিনিটের হাঁটা পথ। চোখ বেঁধে দিলেও চলে যেতে পারবে। ছোটবেলা থেকে বহুবার এসেছে।
বর্ধমান থেকে ট্রেনটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে এসে লাফ দিয়েছিল ছেলেটা। নিজের সীটে বসে দেখেছিল অনীক। ছেলেট

া বসে আছে তার উল্টো দিকের সিঙ্গল সীটে। গোলাপী শার্ট চিমড়ের সঙ্গে জায়গা ভাগাভাগি করে জানালা দিয়ে ব াইরের দিকে চেয়ে আছে।

অনীক ভাল করে লক্ষ্য করে ছেলেটাকে। বয়েস --- তের- চোদ্দ হবে। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলে ধুলো লেগে খয়েরী রঙ ধরেছে। গায়ের রঙ--- আখরোটের খোলার মত। মুখে। নাকে পোষাকে যত্রতত্র লেগে রয়েছে কয়লার গুঁড়ো। কয়লার ওয়াগনে শুয়েছিল নাকি ? পরনের কাপড় দুটোর একটা যে ফুল্প্যান্ট, অন্যটা হাতকাটা স্যান্ডোগেঞ্জি, সেটা বুঝে নিতে এখনও ততটা কল্পনার দরকার হয় না। তবে আর কিছুদিন বাদেই হবে। ছেলেটার গলায় কালো সুতোয় বোনা একটা ম ালা। তা থেকে একটা মাদুলি আর একটা সেফ্টিপিন্ ঝুলছে।

---মাদুলিটা নিশ্চই ওর মা বেঁধে দিয়েছিল--- অনীক ভাবে। ---ওর মা এখন কোথায় ? সে কি আছে এখনও ? নাকি ছিল হয়ে গেছে?--- অবান্তর প্রশ্ন। উত্তর জেনে বা না জেনে তার লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না। তাই ও নিয়ে আব ভাবে না অনীক।

বোবা ছেলেটা এবার ঘাড় ফেরায় কামরার ভেতরের দিকে। অনীক লক্ষ্য করে ছেলেটার চ্যাপটা নাক, মোটা মোটা ঠোঁট, বড়বড় চোখ আর তার চেয়েও বড়বড় চোখের পাতাগুলো। সে চোখে দীনতার লেশমাত্র নেই। একটু আগে ও যে ভিক্ষা চ াইছিল সেটা যেন ওর দাবি ছিল। ওর খিদে ছিল। ওর খিদে পেয়েছিল তাই পয়সা চেয়েছিল। আবার খিদে পেলে আবার চাইবে। ওর স্বাভাবিক অধিকার যেন এটা। বোবা বাচচাটার চোখদুটো যেন সে কথাই বলছে।

মাছি তাড়ানোর মত , কাল্পনিক হাত নেড়ে অবান্তর ভাবনা-চিন্তাকে মন থেকে তাড়ায় অনীক। পাশে রাখাব্যাগ থেকে একটা সিনেমার পত্রিকা বের করে পাতা ওল্টাতে শু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রূপোলী পর্দার রূপোয়মোড়া মানুষ ম ানুষীদের রূপ দেখতে আর তাদের হাঁড়ির খবর জানতে মগ্ন হয়ে পড়ে।

---ভিক্ষে দিয়ে এদের প্রশ্রয় দেওয়া হয় কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়--- নিখুঁত করে দাড়ি কামানো, মাঝখানে সিঁথি করা ঠেউ খেলানো চুল, বাটিকের পাঞ্জাবী পরা বছর পঁয়ত্রিশের একজন মন্তব্য করে। তার উল্টোদিকেবসা, সাদা তাঁতের শা ড়ি পরা, একমাত্র সাদা চুলওলা বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করেই বাটিকের এই মন্তব্য। ভদ্রমহিলা বাচচাটাকে আটআনা দিয়েছিলেন অনীক দেখেছে। সে নিজেও দিয়েছিল আট আনা। আর একজন, বয়স্ক হিয়ারিং এইড লাগানো ভদ্রলোক দিয়েছিলেন তিরিশ পয়সা। আর কেউ কিছু দেয়নি।

বাটিকের পাঞ্জাবীর মন্তব্যে সেই বৃদ্ধা নিত্তর থাকলেও মোটা, কালো ফ্রেমের চশমা পরা ঝাঁটাগুঁফো কিন্তু হাঁ হাঁ করে স ায় দিয়ে উঠল। ---যা বলেচেন মশাই! এগুনোকে ভিক্কে দিয়ে দিয়ে ওবেবস খারাপ কারে দিচ্চি আমরা। এরপর আর ক াজ কোরে খাবার ইচ্ছেই থাকবে না---

---আর বড় হলে যখন কেউ ভিক্ষে দেবেনা তখন চুরিছিনতাইপকেটমারি করে খাবে--- বাটিকের পাঞ্জাবী সিদ্ধান্তে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-চারজন সে মন্তব্যকে সমর্থন করে এবং অচিরেই, কিভাবে ভিক্ষে বা প্রশ্রয় না দিয়ে এইসব ভিখারি ছেলেগুলোকে কাজে জুতে দিয়ে একই সঙ্গে গরিবী হাঠানো এবং দেশের পার ক্যাপিটা ইন্কাম্ বাড়ানো যেতে পারে, অ ার তার ফলে দেশের গ্রস্ ন্যাশ্নাল্ ইন্কাম্ ও অনায়াসে বাড়িয়ে ফেলা সম্ভব, এই সংক্রান্ত আলোচনা শু হয়ে যায় ছুটন্ত ট্রেনের শব্দকে ছাপিয়ে।

অস্ফুট শব্দ। বই থেকে চোখ তোলে অনীক। বোবা ছেলেটা ভিক্ষে করে পাওয়া আধুলি দুটো ঝাল - মুড়িওয়ালার সামনে নাটিয়ে অস্ফুট শব্দে আর ইঙ্গিতে তাকে ঝালমুড়ি বানাবার ফরমাশ করছে। ঝালমুড়ি বিক্রেতা কয়েন দুটো ভাল করে দেখেই--- হবে না-- বলে চলে যাচ্ছিল। বাটিকের পাঞ্জাবী তাকে ডেকে দু-টাকার দিতে বলল।

এরা যে একটাকার ঝালমুড়ি বিক্রি করে না অনীক জানে ! কমপক্ষে দু-টাকার নিতে হয়। একবার ভাবল দু-টাকা দিয়ে ব াচচাটাকে একঠোঙা মুড়ি কিনে দেবে কিন্তু তারপরই মনে হল, সে তো পঞ্চাশ পয়সা দিয়েছে, আবার কি ? আরও তো অনেক লোক আছে এই কামরায়। তাদের তো কোনও দয়া নেই, ও একা কেন দরদ দেখাতে যাবে ?

বাটিকের পাঞ্জাবী ঝালমুড়ির ঠোঙায় মন দেয়। বাচচাটা মন দেয় বাটিকের খাওয়া দেখতে। অনীকও আবার রূপোলী জগতে ডুব মারে।

খানাতে এসে আবার দাঁড়িয়ে গেছে ট্রেনটা। পনের মিনিট হয়ে গেল। আর কতো ভোগাবে কে জানে। অগত্যা প্ল্যাট্ফর্মে

নেমে পায়চারী। গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট থেকে একটা বের করে ধরায় অনীক। মোরেম বিছানো প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌ ট্রেনের দরজা থেকে খানিকটা নিচে বাচচা ছেলেটা লাফ দিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে নামল।

স্টেশনের সীমানার পর থেকেই শু হয়ে গেছে ধানক্ষেত। এখন ধান কেটে নেওয়া হয়েছে। কাটা ধানগাথের গোড়াগুলো ম াথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত ক্ষেতে। অনীকের চোখে পড়ে, বোবা ছেলেটা স্টেশনের টিউবওয়েল থেকে জল খাচ্ছে কলে মুখ লাগিয়ে। ভিখিরী গোছের অল্পবয়স্ক একটা মেয়ে টিউবওয়েল পাম্প করে দিচ্ছে।

---তবে হ্যা, সার্থক ফ্রীজ শটের কথা যদি বলতে হয় তো, নাইন্টিন ফিফটি নাইনে তোলা ব্রুফোর ফোরহান্ড্রেড্‌ ফোর হ ান্ড্রেড্‌ ব্লোজ্‌ ছবিটার কথা বলতেই হবে। তুমি দেখেছ ছবিটা?---- গোল, সোনালী ফ্রেমের চশমা, হাঁটুর কাছে ছেঁড়া রঙ ওঠা নীল জীন্‌স্‌ আর রক্তলাল রঙ-এর গোলগলা টি শার্ট ছেলেটা। ফর্সা, বেঁটে একমাথা উস্কোখুস্কো চুল। গালে কয়েকদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ।

প্রটা যাকে করা হল, সেই মেয়েটার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে ঘন নীল জিনস্‌। গাঢ় সবুজ গোলগলাঢলা টি শার্ট। দু'জনের পায়েই ভোঁতামুখো, ফিতে বাঁধা বড় বড় জুতো। এরা শিয়ালদা থেকেই উঠেছিল বোধহয়। অনীক উঠে থেকেই এদের দেখছে। ছেলেটা তারই বয়েসী হবে। মেয়েটার কিছু কম। খুব সম্ভব বোলপুরে নামবে। ছেলেটা সমানে বক্‌বক্‌ করে চলেছে। সেই শু থেকেই, কুরোসাওয়াঘটকওজুপুদোভকিন--- রায়ফেলিনিরোনোয়াসেনআইজেনস্টাইনচ্যাপলিন্‌ চলছে। দুজনের সঙ্গে দুটো চামড়ার ব্যাকপ্যাক। পাশে রাখা ম্যাগ্‌নাম্‌ কোক্‌-এর বোতলচুমুক মারছে মাঝেমধ্যে ভাগাভাগি করে। ওদের গা থেকে বিলিতী পারফ্যুমের গন্ধসারা কামরায় ছড়িয়ে পড়ছে থেকে থেকে। ওদের কথার মতন।

---ফোর্‌ হান্ড্রেড্‌ ব্লোজ্‌-এর প্রধান চরিত্র একটা বাচচা ছেলে--- হাঁটুছেঁড়ে জীন্‌স্‌ ঘননীল জীন্‌স্‌কে ব্যাখ্যা করতে থাকে হ াতমাথা নেড়ে--- ছেলেটা, নাগরিক সভ্যতা, তথা পচনশীল সভ্যতার শিকার এখানে। রিফর্মেটরীতে ভর্তি করে দেওয়া হল তাকে শেষ পর্যন্ত। ছবির শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে ছেলেটা রিফর্মেটরী থেকে পালাচ্ছে। পালিয়েদৌড়াচ্ছে--- দৌড় াচ্ছে--- একসময় সে সমুদ্রের সামনে এসে পড়ে। সামনে আর পথ নেই। হতাশ ছেলেটা ঘুরে দাঁড়ায়। এই সমাজ, সভ্যত ার মুখোমুখি। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের দৌড়ে আসছে ক্যামেরার দিকেই, অর্থাৎ যেখান থেকে সে পালাতে চেয়েছিল, সেদিকেই। তার দৌড়ের মাঝখানে, ঠিক এই জায়গায় ছবি শেষ হয়ে যায়। ফ্রীজশটে। --- ছেঁড়া জীন্‌স্‌ তার দুই হাতের বুড়ো অ াঙুল-এর সঙ্গে লম্বাভাবে সমকোণে অন্য আঙুলগুলোকে রেখে, বুড়ো আঙুল দুটোকে প্রায় মাথায় মাথায় ঠেকিয়ে পাক্কা চিত্রপরিচালকের ভঙ্গীতে হুউশ্‌ করে ঘননীল জীন্‌স্‌্‌র একদম মুখের সামনে নিয়ে যায় হাতদুটো। তাক বুঝে মুখ সরিয়ে ন া। নিলে নাকে গুঁতো খেত ঘননীল জীন্‌স্‌।

---জানো? স্বয়ং সত্যজিত রায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, এখানে ফ্রীজশটের ব্যবহার শুধু চমকপ্রদই নয়, গভীরভাবে অর্থপূর্ণও বটে। যাকে বলা যায় স্ট্রোক অফ্‌ জিনিয়াস্‌। ছেলেটার যাওয়ার আর কোনও পথ নেই। সুতুরাং যেযতই ছুটুক না কেন, সেটা থেমে থাকারই সামিল--- ছেঁড়া জীনস -এর ঠোঁটের কোণে ফ্যানা জমে ওঠে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে বলতে। -- -এখানে ছেলেটা যেন বলতে চাইছে, তোমরাই বলে দাও আমার মতন ছেলেদের সমস্যাকিভাবে? সত্যিই, ছবিটা দেখে, ছেলেটার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন--- কোক্‌ -এর বোতলে চুমুক মারে ছেঁড় াজীন্‌স্‌। ট্রেন ছুটে চলে.....

লেবু চা বিক্রি হয় এই লাইনের ট্রেনে। লেবু বাদ দিয়ে শুধু এককাপ লিকার কেনে অনীক। এককাপ দু-টাকা। বোবা বাচচাট াও অমনি আধুলি দুটো বের করে এগিয়ে দেয় চাওলার দিকে। একবার মুখের দিকে তাকিয়ে ওকেও আধকাপ চা ঢেলে দেয় চা-ওলা। প্লাস্টিকের চা-এর কাপটা দুহাতে ধরে, উজ্জ্বল চোখে সকলের দিকে তাকায় ছেলেটা। তারপর সোজা হয়ে বসে বুকের কাছে কাপটা ধরে ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা নামিয়ে এনে অদ্ভুত ভঙ্গীতে চায়ে চুমুক দেয়। মাথা তুলে গর্বভরে তাকায় আবার, সকলের দিকে।

---এছেলে বড় হলে লিচচয় পকেটমার হবে-- ছেলেটার সঙ্গে একই সীটে বসা গোলাপী শার্টের মন্তব্য। ভিখিরী বাচচার চা কিনে খাওয়া সহ্য করতে না পেরেই বোধহয় এই মন্তব্য করে গোলাপী শার্ট। তারপর সমর্থন পাবার জন্য সবার মুখের দিকে তাকায় একবা করে।

ঝাঁটাগুঁফো যথারীতি অগ্রণী ভূমিকা নেয় গোলাপী শার্টের সমর্থনে--- বড় হলে কি বলচেন? অ্যাকোনই পকেট কাটে

হয়ত দেকুন গো! এগুনোকে কোনও বিশ্যেস আছে নাকি ?--- বলতে বলতে নিজের পকেটের ওপর একবার হাত বুলিয়ে দেখে নেয়। ---ও পকেটমার হবে না। আমরা ওকে পকেটমার বানাবো। বানিয়ে ছাড়বো, বুঝলেন?--- হিয়ারিং এইড্ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার মুখ খুললেন।

হিয়ারিং এইড-এর আচমকা প্রতিবাদে ঝাঁটাগুঁফো একটু থমমত খেয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই--- তা কি করে বলচেন মশায়-- বলে তর্ক বাধাতে যায়। ---তুমি বেশি নাপ্‌তামো না মেরে এট্টু চুম্‌মেরে বসে দিনি! তোমাকে না পইপই করে বলিচি রাস্তাঘাটে বেশি কথা বল্‌বেনি?--- খ্যান্‌খ্যান ঝাঁঝালো গলা গুঁফোর বউ-এর । এতক্ষণ ছেলেকে ডিমসেদ্ধ খাওয়াচ্ছিল। এর আগে কলা খাইয়েছে দুটো। সেদ্ধ ডিমের টুকরো চারপাশে ছড়াচ্ছে ছেলেটা। বইয়েরধমক খেয়ে ভিজে মুড়ির মতন চুপসে যায় ঝাঁটাগুঁফো। হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গিয়েই বোধ হয়। ডানপাশের কাগজ পড়তে থাকা ভদ্রলোকের কাগজটা খামচে ধরে--- একটু নিচ্ছি--- বলে একটান মারে। কাগজের একটা টুকরো ছিঁড়েচলে আসে গুঁফোর হাতে।

ভদ্রলোকের জ্বলন্ত দৃষ্টি থেকে প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে গুঁফো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। কিন্তু রেহাই নেই। বউ-এর আগুন চোখের সামনে এসে পড়ে সে। গুঁফোর খুব ঘুম পায় হঠাৎ। ঢুলতে থাকে বসে বসে।

প্লাস্টিকের চায়ের কাপটা দুমড়ে মুচড়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে আর একটা গোল্ডফ্লেক ধরায় অনীক। খানা স্টেশন থেকে ভিড় বেড়ে গেছে। ভীড়ের ঠ্যালায় লোকজন গায়ের ওপর এসে পড়ছে। অনীকের সীটে ভাগাভাগি করে বসে গেছে শিশু কোলে এক আদিবাসী রমণী। চিলতে মাত্র বসার জায়গা পেয়েই অনীকের দিকে পিঠ করেবাচচাকে মাই দিতে শু করে দিয়েছে। এরপর থেকে প্রতি স্টেশনেই এরকম আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের দল ওঠানামাকরতে থাকবে।

বোবা ছেলেটার সঙ্গে যে একটা পলিব্যাগ ছিল অনীক খেয়াল করেনি। সীটের নিচে রেখে দিয়েছিল। বের করে আনল নিচু হয়ে। ব্যাগটাতে দুটো পাকা আম। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। একটা আম ব্যাগ থেকে বের করেছেলেটা। অনীক দেখল আমটার একদিক সম্পূর্ণ পচা। কালো হয়ে রস গড়াচ্ছে সেদিকটা থেকে। অন্যদিকটা অবশ্য ভালই মনে হচ্ছে। অন্য আমটারও নিশ্চয়ই একই দশা। না দেখেই অনুমান করে সে। কোনও ফলওলা বোধহয় দিয়েছে দয়া করে।

ছেলেটা আমের ভাল দিকটা বাগিয়ে ধরে মুখের কাছে নিতেই গোলাপী শার্ট হাঁ হাঁ করে তেড়ে ওঠে। --অ্যাই! খবদ্দার এখানে খাবি না। জামা কাপড়ে রস পড়বে। ঢুকিয়ে ফ্যাল্ শিগগীর! ---বোবা ছেলেটা একবার গোলাপী শার্টের দিকে, একবার অনীকের দিকে তাকায়। অনীক চোখ সরিয়ে নেয়। আমটাকে ব্যাগের ভেতর চালান করে ব্যাগটাকে ফের সীটের নিচে চালান করে দেয় ছেলেটা। তারপর জানলায় থুতনি রেখে ছুটন্ত মাঠপুকুরক্ষেতগাছপালারেললাইনটেলিগ্রাফেরতারতারেরবসাফিঙে দেখতে থাকে একমনে।

হঠাৎ ঘাড় ঘুড়িয়ে আবার, কামরার ভেতরের বসে দাড়িয়ে থাকা যাত্রীদের দিকে তাকায়। ফিক করে হাসে একবার। আপনমনে। আবার জানালার দিকে মুখ ফেরায়। অনীক লক্ষ্য করে ব্যাপারটা।

--কোথায় যাবে ছেলেটা? --কি নাম ওর? ---আসছেই বা কোথা থেকে? ---ও কি বাড়ি থেকে পালিয়েছে? ---বাড়ি কি আদৌ আছে ওর? ---শেষবার কখন খেয়েছে? ---আবার কখন পেট ভরে খেতে পাবে? --- হঠাৎ একগাদা প্রশ্ন ভীড় জমায় অনীকের মনে। --মক গে যাক ! তার অত কিসের মাথাব্যাথা? এরকম বাচচা ছেলেমেয়ে কয়েককোটি ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দেশের রাস্তাঘাটে ট্রেনে বাসে আস্তাকুঁড়ে। সারা পৃথিবীতে অনেক অনেক বেশি। বড় হতে হতে এদের মধ্যে কেউ কেউ পেট বাঁচাতে কাজ জুটিয়ে নেবে যাদের সরকারী নাম হবে শিশু শ্রমিক আর বাকিরাও নানারকম কাজ জুটিয়ে নেবে পেট বাঁচাতে, তবে এদের সরকার স্বীকৃত নাম হবে শিশু অপরাধী বা শিশু যৌনকর্মী ইত্যাদি এবং এই শ্রেণীর শিশু অপরাধীরাই কাল দিনে পাকা অপরাধী হয়ে উঠবে কিন্তু এ সমস্যার কোনও সমাধান, অন্তত এখনও নেই। ভবিষ্যতেও কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ । সুতরাং যে সমস্যার সমাধান নেই তা নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামাবার কোনও মানে হয় না।

শবীর ঘেমে চামড়া আর টি-শার্ট একাত্ম হয়ে আছে। পিসীর বাড়ি ঢুকেই কুয়োর ঠাণ্ডা জলে ভাল করে স্নান করতে হবে। অনীক মনে মনে পরবর্তী কর্মসূচী সাজাতে থাকে।

কিন্তু প্রশ্ন এড়াতে পারে না সে। --- ছেলেটা অমন করে হাসল কেন? ---ওর হাসিতে কি অনুকম্পা মেশানো ছিল? --বয়স্ক সমাজের প্রতি, বয়বৃদ্ধ সভ্যতার প্রতি অনুকম্পা? ফিরিয়ে আনে অনীক। ---না ---কিছু ভাল্লাগছেনা--- কখন যে রামপুরহাট আসবে--- ট্রেনটা যে আর চলতে পারছে না--- ধুঁকতে ধুঁকতে কোনও রকমে এগোচ্ছে--- নেহাত না এগোল

নয়, তাই---
সময় কাটানো এক সমস্যা এখন। বরং একটা খেলা যাক। এই খেলাটা আগেও অনেকবার খেলেছে অনীক। কোনও ম
ানুষকে দেখে তার নাম কি হতে পারে সেটা কল্পনা করা। উদ্ভট এই খেলাটা একান্তই ওর নিজের সঙ্গে নিজের। তবে উদ্ভট হলেও, একা একা আসল মুহূর্ত কাটানোর পক্ষে দিব্যি খেলা একটা।
---ঐ চিমড়ে গোলাপী শার্টের নাম তো নির্ভুলভাবে ছিদাম--- আর ঐ বাবরি চুল বাটিকের পাঞ্জাবির নাম,হয় প্রণয় না হয় প্রাণনাথ হতে বাধ্য--- হিয়ারিং এইড্ এর নাম--- ম্‌ম্‌ম্ ওনার নাম নিশ্চই সন্তোষমোহন--- ঝাঁটাগুঁফোর বউ-এর ন
াম--- চামেলীবালা না হয়ে যায় না--- আর ঝাঁটাগুঁফোর নাম তো ডেফিনিট্‌লি গুগতি।
---আচ্ছা, এই বোবা ছেলেটার নাম কি হতে পারে? ---অনীক ভাবতে থাকে--- অপু? ---শালিক? ---জগ্নু? ---বুধন? -
-- রিচার্ড? ধনপত্ নাম হলে কেমন হয়? ---গরীব নাম হয় যদি?
নোআদার ঢাল। অদ্ভুত নাম স্টেশনের। এইসব ছোট ছোট স্টেশনেও চার - পাঁচ মিনিট করে দাঁড়াচ্ছে হতচ্ছাড়া ট্রেনটা। চা ওলা ডেকে আর এককাপ লিকার নিয়ে চুমুক মারে অনীক। ট্রেনটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় মিনিট তিনেক ধরে। হঠ
াৎ, বোবা বাচ্চাটা তার পলিব্যাগটা বগলে চেপে দরজার দিকে রওনা দেয়। যতদূর মনে হয়এটা ওর গন্তব্য ছিল না। ওর গন্তব্যের কোনও ঠিকই নেই হয়ত। এক্ষুনি হয়ত পাশের কামরায় উঠে ভিক্ষে করতে শু করবে। গন্তব্যজ্ঞানহীন ছেলেটাকে নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। অনীকও না। স্টেশনের লোকজন আর তাদের ব্যস্ততা আর তাদের ব্যস্ততা দেখতে দেখতে অলস মুহূর্তগুলো পার করতে থাকে সে।
প্ল্যাটফর্ম যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর থেকে কিছুটা ঢালু জমি নেমে গিয়ে সমতল ধানক্ষেতে মিশেছে। এইজন্যেই স্টেশনের নাম এর পেছনে ঢাল কথাটা রেখেছে কিনা কে জানে। স্টেশন থেকে নেমে যাওয়া এই ঢালটা বেশ খাড়া। জোয়
ান লোককেও সাবধানে নামতে হবে, না হলে পা হড়কে যাবার সম্ভাবনা।
ঢালের শেষে আকাশমণি গাছের সারি স্টেশনের সীমারেখা এঁকে দিয়েছে। গাছের সারির ফাঁক দিয়ে যতদূর দেখা যায় ধ
ানক্ষেত। এদিকের সব ক্ষেতের ফসল এখনও কাটা হয়নি। কাজ চলছে। হাওয়া এসে সোনালী ধানের শীষগুলোকে অ
াদরে আদরে অস্থির করে তুলছে থেকে থেকে।
ধানক্ষেত আর আকাশ যেখানে মিশেছে, সেই দিগন্তরেখাকে কিছুটা আড়াল করে আছে কয়েকটা মাটির ঘর, তালগাছ আর অন্যান্য কয়েকটা বড় গাছ। ট্রেন থেকে দেখে আঁকা ছবি মনে হয়। একটা পুকুরও নিশ্চয়ই থাকবে ঐ ছোট্ট গ্রামট
াতে। দিনের আলো ক্রমশ কমে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাবে এইসব ক্ষেত, গাছপালা শুধু গুটিকয় টিমটিমে আলো জ্বলবে স্টেশনে আর ঐ দূরের গ্রামটাতে। আর, এই দুইপ্রান্তের আলোর মধ্যবর্তী জমাট বিস্তীর্ণ অন্ধকারে সবুজ ছায়াপথ তৈরি করে মাঠে, গাছে গাছে উড়ে বেড়াবে অসংখ্য জোনাকি। ঝিঁঝির একটানা ডাকই হবে তখন একমাত্র পার্থিব শব্দ।
অনীকের চোখ চলে যায় স্টেশনের এক প্রান্তে। খুনখুনে এক বুড়ি, পরণে ময়লা থান, বগলে একটা কাপড়ের পুঁটলী। হাতে গাছের ডাল ভেঙে বানানো একটা লাঠি। বয়সের ভারে সামনে নুয়ে পড়েছে বুড়ি। স্টেশনের প্রান্তে এসে থমকে দাঁ
ড়িয়েছে। একা একা নামতে পারছে না ঢালু পথটা। ভয় পাচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে অসহায় চোখে। লোকজন এমনিতেই কমে এই স্টেশনে। যারা আছে, তারাও নিজেদের মত যে যার দিকে চলে যাচ্ছে। কেউ ভ্রুক্ষেপ করছে না বুড়ির দিকে।
ট্রেন ছাড়ার বাঁশী বাজে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে শু করে দানব যন্ত্রসাপটা। অনীক জানালা দিয়ে দেখতে পায় হঠাৎ, কোথা থেকে সেই বোবা ছেলেটা বুড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বুড়ির একটা হাত ধরে সাবধানে, আস্তে অ
াস্তে পার করে দিচ্ছে ঢালু জমিটা। ছেলেটার অন্য হাতে ঝুলছে পলিব্যাগে দুটো আম। আধপচা। অনীক জানে।
প্রতি মুহুর্তে দূরে সরে যেতে থাকা সেই বালক, নুব্জ্যা বৃদ্ধা, দিগন্ত বিস্তারী ধানক্ষেত আর ক্রমশ ম্লান হয়ে আসা দিনের আলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অনীক। স্তব্ধ হয়ে।
--- ছেলেটার নাম হোক জীবন--- আপনমনে বিড়বিড় করে ওঠে সে।
প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিজের গতি বাড়িয়ে ছুটে চলে।

গন্তব্যের দিকে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com